কবিতা প্রকাশ: কবি, সম্পাদক, পত্র-পত্রিকা, গোষ্ঠীতন্ত্র বা উদারমনস্কতা

মেঘ মুখোপাধ্যায়

কবিতা লিখলেই তো হল না, সেই কবিতাটি প্রকাশিত হওয়া চাই। লোকচক্ষুর গোচরে আনা চাই কবিতাটিকে। তুমি যে একটি কবিতা লিখে উঠেছ— যাঁরা কবিতার অনুরাগী তাঁদের কাছে তো তা জানান দিতে হবে— তাঁরাই যদি তা না জানলেন তবে আর তোমার কবিতা লেখার সার্থকতা কিসের!

'সার্থকতা'! 'কবিতা লেখার সার্থকতা'! খুব বড় হয়ে গেল নাকি কথাটা? যেন নাগালের বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছে। তবে সহজ করে তো বললেই হয় যে, 'তবে বাপু তোমার কবিতা লেখা কেন?' কবি-শিল্পীরা অনেকে বলেন বটে, বড় মুখ করেই বলেন অনেকে, আবার হয়ত-বা কেউ বলেন মাথা নিচু করে, মাটিতে চোখ নামিয়ে, নম্র মেঘলা গলায় যে তাঁরা কবিতা লেখেন নিজেদেরই জন্য। অন্য কারুর কাছে তা পৌঁছল কিনা তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না। বয়েই গেল আর কী! কবিতাটি কবির গহন মন থেকে বেরিয়ে এসেছে, কাগজের ওপর কালির অক্ষরে মুক্তি পেয়েছে কিংবা কম্পিউটারের পর্দায় আকার লাভ করেছে— যাক বাবা বাঁচা গেল, যথেষ্ট হয়েছে। কবি দায়মুক্ত।

কবি দায়মুক্ত? কবি দায় এতেই ফুরল? কবিতাটি লেখা হল আর নটেগাছটি মুড়ল? এবার যাঁদের দরকার তাঁরা বুঝুন (বা না-বুঝুন), তা নিয়ে কবির মাথাব্যথা নেই; কবির কাজটা কবি করে দিয়েছেন বা করে নিয়েছেন তাঁর নিজের জন্য; কবিতা লেখা তো নয়, তাঁর বুক থেকে মস্ত এক পাষাণভার নেমে গিয়েছে, আর তিনি হাপ ছেড়ে বেঁচেছেন— এবার সেই কবিতাটিকে নিয়ে কারা কী করবে অথবা কবিতাটির কী গতি হবে সে নিয়ে তিনি ভাবিত নন— ভাবতেই চান না আর! তিনি প্রস্তুত হবেন আরেকটি কবিতা লেখার জন্য— সেটাই তো তাঁর যথার্থ দায়— তাই নয় কি?

তাই কি? আসলে কি তাই? এমন সহজ হয়ে গেলে তো ভালোই হত। এত সহজে কবি যদি হাত ধুয়ে ফেলতে পারতেন তাঁর সৃষ্টি থেকে তাহলে তো কথাই ছিল না। সত্যিই সেটা বেশ ভালো হত কবির পক্ষে। কবি বেঁচে যেতেন। তেমন হওয়াটাই ছিল বাঞ্ছনীয়, অভিপ্রেত— কবির কাছে, আমাদের কাছেও। কিন্তু তেমনটি তো সচরাচর ঘটে না কিংবা ঘটে কয়েকজন কবির দুর্লভ ভাগ্যে, যা হিসেবের মধ্যে না আনাই ভাল।

কবির প্রথম জীবনে অর্থাৎ কিনা কবিজীবনের প্রথমভাগে কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ কবিকেই তার কবিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। আর অর্জন করতে হয় তিক্ত-কষায়-রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কিছু পীড়াদায়ক আবার কিছু উল্লাসজনক। প্রথমত, কবিতাটি লেখা গেল কিন্তু যতক্ষণ না তার জন্মসংবাদ পাঁচকান করা যাচ্ছে কবির নিস্তার নেই। কবিতা লিখলেই হল না, সেটিকে প্রকাশ করতে হবে; সোজা ভাষায় ছাপাতে হবে— পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়ে বের করতে হবে। না হলে সব মাটি। 'কবিখ্যাতি' বা 'কবিযশ' বলে একটা কথা আছে; এই যশ-খ্যাতি কালক্রমে কত দূর বিস্তৃত হবে, কীরকম ঢেউ তুলবে

সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজের বুকে; ক্ষণস্থায়ী, স্বল্পকালস্থায়ী অথবা চিরস্থায়ী হবে কিনা সে পরের কথা; কিন্তু কবিযশ তো জুটবেই না যদি না উপযুক্ত স্থানে কবিতাটি মুদ্রিত হয়। 'যশ', 'খ্যাতি'— এসবও কি বড় কথা হয়ে যাচ্ছে না? তবে নিতান্ত ঘরোয়া করে নিয়ে বলা যাক 'পরিচিতি' বা 'স্বীকৃতি'।

কবিজীবনের প্রথমভাগে একজন তরুণ ভাবেন যে তিনি 'কবিতা' ভেবে যা-কিছু লিখছেন তাই কবিতা, তিনি কবিতার অস্থিমজ্জার ভিতরে ঢুকে গেছেন, আঁত ছুঁতে পেরেছেন, তাঁর কলম থেকে নির্গত অনর্গল শব্দস্রোত কবিতা ছাড়া আর কিছুই না। আর সমস্ত পৃথিবী এসব জ্বলন্ত পঙ্‌ক্তিরাশি গ্রহণ করার জন্য উদ্বাহু হয়ে আছে! কিন্তু তিনি যে কবিতা লিখতে পারেন তার একটা স্বীকৃতি মেলা দরকার। সে স্বীকৃতি দেবে কে? কারা? তাঁর নিকটজন, বন্ধুবান্ধব? আত্মীয়পরিজন বা বন্ধুবান্ধব কারও কবিতা পড়ে বাহবা দিতেই পারে— তাতে কোথাও আটকাচ্ছে না। কিন্তু একজন কবির বা তাঁর লেখা কবিতার আসল স্বীকৃতি দেবার অধিকারী হলেন সেই মহাজন যাঁকে আমরা বলি সম্পাদক। কোনও সাময়িকপত্রের সম্পাদক। সম্পাদক যদি কবিতাটি পড়ার পর খুশি হয়ে গ্রহণ করেন আর তাঁর পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়ে পাঠকসমাজের গোচরে আনেন তবেই বোঝা যাবে যে কবিতা আর তার রচয়িতা স্বীকৃতি পেল। এরপর তো আসছে পাঠকসমাজ।

কবিতা লেখার পর একজন কবিকে পৌঁছতে হয় সম্পাদকের কাছে। পৌঁছতে হয় কারণ যদি তিনি বিবেচনা করে খুশি হয়ে তাঁর পত্রিকায় কবিতাটিকে ঠাঁই দেন। এই ঠাঁই পাওয়ার মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয় কবির দুটো অভিপ্রায়: লেখাটা যে কবিতা হয়েছে, সেই স্বীকৃতি সংগ্রহ, আর কবিতানুরাগী পাঠকসমাজের দরবারে কবিতাটিকে পেশ করতে সমর্থ হওয়া। সম্পাদকের পত্রিকায় কবির ঠাঁই পাওয়ার প্রসঙ্গটিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যেতে পারে কবির কাছে সম্পাদক হলেন এক কঠিন ঠাঁই। তিনি যেমন অনেক অজ্ঞাত প্রতিভার আবিষ্কারক, অনেকের পালন-পোষণ-প্রতিষ্ঠার পিছনে মূল চালিকাশক্তি, প্রচার-প্রসার-পুরস্কারের নিপুণ সংগঠক তেমনই বিপরীতক্রমে অনেক যোগ্য কবিতারচয়িতার প্রকাশে পরাঙ্মুখ, অনাদর-অযত্ন প্রদর্শনে অকুণ্ঠ, বিস্মরণ বা উদাসীনতার নির্মোকে নিখুঁত হিসাবপরায়ণ। কোন কবিদের তিনি পৃষ্ঠপোষণা করবেন আর কাদেরই-বা করবেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন— তার ওপরই নির্ধারিত হয়ে যায় একটি যুগের কাব্যক্ষেত্রের কত কিছু। নামজাদা কবিতা পত্রিকার বা বিখ্যাত কোনো সাহিত্যসংস্কৃতি পত্রিকার কবিতাবিভাগের সম্পাদক হলেন এক অদৃশ্য ক্ষমতাকেন্দ্র। তাঁর সমকালে কে বা কারা দুর্দান্ত কবিতা লিখতে পারে, তাঁর বিচারে আঙুলে গোনা গুটিকয়েই তা পারে, আর কারা পারে না, অধিকাংশই, ফলে তাঁর সম্পাদিত কাগজের নানা সংখ্যায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকজনেরই কবিতা প্রকাশিত করে তোলার আয়োজন করেন তিনি, বাকিদের প্রকাশ-বিকাশের প্রতি নিষ্ঠুর অমনোযোগী হয়ে থেকে। এই প্রক্রিয়াটা চলতে চলতে একসময় দ্যাখা যায় যে তাঁর নিবিড় পরিমণ্ডলে অহরহ অবস্থানরত কয়েকজনকেই তিনি কবি বলে মনে করেন, তাঁদের কবিতা প্রকাশেই তিনি উৎসুক— অচেনাদের, দূরবর্তীদের গুণের সন্ধানে মনের যে সজীবতা আর তৎপরতা তা তিনি হারিয়ে ফেলেন। একটি সংকীর্ণ চক্রমধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এ

জাতীয় সম্পাদক মনে করেন যে তাঁর হাতের পাঁচ এই ক'জন কবিই বাংলা কবিতার সাম্প্রতিকতার একমাত্র ধারকবাহক। বাকিরা বাংলার কাব্যজননীর অবাঞ্ছিত সন্তান, কাজেই তাদের স্থান হোক আস্তাকুড়ে। আমার আয়ত্তে থাকা কাগজে বা পৃষ্ঠাগুলিতে কিছুতেই তাদের কবিতা ছাপাব না। নানা ছলে দূরে ঠেলে রাখব।

এই সম্পাদকরা হয়ে থাকেন নিজেরাও কবি, উঁচুজাতের কবিই তাঁরা। একটি ভাষার কবিতাকে তাঁরা নিজ রচনাগুণে সমৃদ্ধ করেছেন, কবিতা লিখে যশ অর্জন করেছেন। তাঁরা নিজেরাও বর্তমান কবিতা ক্ষেত্রটির স্টেকহোল্ডার। সম্ভবত সেখানেই বিপত্তি। অকবি সম্পাদক হলে এমনটা ঘটত না বলেই আমার বিশ্বাস। এই সম্পাদক-কবিরা কবিতার এমন এক উঁচু মান নির্ধারণ করে রাখেন যাকে বলা যেতে পারে স্বর্গীয়। তাঁর কাগজে কবিতা প্রকাশে উৎসুক কোনো কবির রচনা যদি না ওই স্বর্গীয় মানে পৌঁছয় তবে তিনি তাঁর কবিতা ছাপেন কী করে! আবার এই স্বর্গীয় মানটি কী বা কেমন তার নির্ণায়ক তো কেবল তিনিই। ফলে তিনি কাকে রাখবেন কাকে ফেলবেন তাঁর এই স্বর্গীয় মান নির্ণয়ের কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করে সে এক রহস্য। অথবা রহস্যের কিছুই নেই সব কিছু জলের মতো সহজ।

আমরা জানি, একটি কবিতা পত্রিকার আর একটি বিখ্যাত সাময়িকপত্রের কবিতাবিভাগের সম্পাদকরূপে কী বিস্তৃত উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আকাশের মতো ছিল তাঁর বক্ষপট। কবিতার উচ্চমান বা কবিতা কত দূর উৎকৃষ্ট লেখা হতে পারে এ বিষয়ে কোনো কল্পিত স্বর্গীয় ধারণার দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন না তিনি। কবিতা বা যেকোনো শিল্পকর্ম অবশ্যই চূড়ান্ত উৎকর্ষতা অর্জন করবে, কবির অভীষ্ট হবে পরম নৈপুণ্য অর্জন করা— এতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না— বিন্দুমাত্র না— আমি তার সাক্ষী— তাঁর সঙ্গে আমার সে অভিজ্ঞতা হয়েছে; উৎকৃষ্ট না হলে, নৈপুণ্যের পরিচয়ে উজ্জ্বল না হলে কোনো কবিরই কোনো কবিতা ছাপতে দেওয়া উচিত নয়, কবিকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই নৈপুণ্য আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, যত্নবান হতে হবে, একাগ্র হয়ে থাকতে হবে— এমনকী পরিণত বয়সেও, যখন তাঁর কবিখ্যাতি চরম শিখরে আরোহণ করেছে, তাঁর কাছ থেকে একটি কবিতা পেয়ে নিজেদের কাগজে ছাপানোর জন্য সম্পাদককুল মরিয়া হয়ে আছে— তখনও; কিন্তু যখন সুনীল সম্পাদক তখন কোনো কবির কবিতা একটি কল্পিত স্বর্গীয় মান অর্জন করলে পরেই যে তিনি তাঁর কাগজে ছাপবেন নতুবা কিছুতেই ছাপবেন না এমন শুষ্ক কাঠিন্য তাঁর ছিল না। কবিতা বিচারের ক্ষেত্রে বা কবিতা হয়েছে কি না বোঝার ক্ষেত্রে, একটি কবিতা নিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেবার আগে অর্থাৎ দূরে ঠেলে সরিয়ে দেবার বা বাতিল করে দেবার আগে একজন সম্পাদকের মনে রাখা জরুরি যে কবিতার মতো বিষয়ে মাননির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুষ্ক কাঠিন্যের চর্চা আসলে সংকীর্ণতারই চর্চা এবং হয়ত নিপাট স্বেচ্ছাচারিতারও।

কবিতা প্রকাশের জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে বহু তরুণ আর বয়স্ক কবিদেরই যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হল তিনি ছিলেন উদারমনস্ক, তাঁর সম্পাদক-হৃদয় ছিল অনেক চওড়া, তাঁর বিবেচনার পরিধি ছিল বিস্তৃত, ব্যাপক। শোনা যায় যে এই বিশাল

হৃদয়বত্তার কবি-সম্পাদকটিকে তাঁর এই প্রকৃতি বা স্বভাবের জন্য তাঁর প্রিয়তম সুহৃদ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই বকুনি খেতে হত, খোঁটা হজম করতে হত— কেন তিনি এত কবিকে প্রশ্রয় দেন, লালন-পালন করেন— কিন্তু তবুও তিনি দমেননি। মাত্র গুটিকয় কবিই (বা তরুণ কবিই) কবিতা লিখতে পারে, তাদেরই কেবল ছাপিয়ে যেতে হবে, আর বাকিরা ঘাস ছিঁড়তে এসেছে, তারা কিছুই লিখতে পারে না। অতএব তাদের প্রতি উদাসীন আর নীরব থেকে তাদের নিপাত দেওয়ার বন্দোবস্ত করো— এ তিনি মানতেন না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বাহুল্য যে আমরা জানি একটা যুগে যে কবিরা লেখেন (বা যে গল্পকাররা লেখেন বা যে ঔপন্যাসিকরা লেখেন বা যে চিত্রকররা ছবি আঁকেন বা যে নাট্য বা চলচ্চিত্র-নির্দেশকরা নাট্য বা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বা যে...) তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের বিদ্যায় অধিকতর উৎকর্ষের বা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন, পাঠকসমাজে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে ওঠেন— তাই বলে অন্যদের সৃষ্টি ন্যূন হয়ে যায় না, বাতিল হয়ে যায় না। একটি যুগের প্রত্যেক কবিরই, প্রত্যেক কবিতারচয়িতার সৃষ্টিপ্রয়াসেরই স্বতন্ত্র মূল্য থাকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রয়েছেন বলে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বাতিল হয়ে যান না, জয় গোস্বামী রয়েছেন বলে ভাস্কর চক্রবর্তী আর মৃদুল দাশগুপ্ত বা শ্যামলকান্তি দাশ খারিজ হয়ে যান না। সুব্রত রুদ্র, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুবোধ সরকারের স্বতন্ত্র মূল্য থাকে। এই প্রসঙ্গটাকে আরেকটু বাড়িয়ে নিয়ে বলা যায় যে কাউকে বাতিল করার দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে তো সময়, বড় করে যাকে বলে কাল। যোগ্য কিছু লিখতে না পারলে কালের সন্মার্জনী লাঞ্ছনায় কারো নাম তো এমনই মুছে যাবে। তোমার হাতে একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব রয়েছে, কবিতাবিভাগের কয়েকটি পৃষ্ঠা অধিগত রয়েছে বলে সেখানে কবিতা প্রকাশে উৎসুক কোনো জায়মান অনভিজ্ঞ তরুণ বা পরিণত কবির কবিতা স্বর্গীয় উচ্চমান অর্জন করেনি বলে উপেক্ষা করার, তাচ্ছিল্যে দূরে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত মূঢ়তার নামান্তর। সম্পাদক সুনীলের উদারমনস্কতার (কবিতাপত্র বা পত্রিকার কবিতাবিভাগ) গোত্রের সম্পাদক হিসাবে আমি দেখেছি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (অলিন্দ), অমিতাভ দাশগুপ্ত (পরিচয়), সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (বিভাব), পবিত্র মুখোপাধ্যায় (কবিপত্র), সুব্রত রুদ্র, আবদুর রউফ (চতুরঙ্গ), গৌতম ঘোষ দস্তিদার (রক্তমাংস), সৈয়দ খালেদ নৌমান (অর্কেস্ট্রা-বহরমপুর), দীপেন রায় (কবিতা সীমান্ত) আর তাপস রায় (সুইন হো স্ট্রিট)-কে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রোজ্জ্বল বলে এই লিখনমুহূর্তে এই সম্পাাদকদের নাম করলাম। প্রত্যেক কবিরই নিশ্চয় এরকম আরও অনেক সম্পাদকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। তবে কি আমি বলতে চাইছি যে একজন সম্পাদক কবিতার নামে কোনো ব্যক্তির লেখা যা-কিছু ছেপে দেবেন— কোথাও তাঁর শিক্ষাদীক্ষা-রুচি-বিবেচনাবোধ কাজ করবে না? আমার এ আস্থা আছে যে আমার ওপরের লেখাটি পড়ে সে-কথা নিশ্চয় কারো মনে হবে না।

একটি কবিতা লেখা হবার পর প্রত্যেক কবিই চান একটি 'নামজাদা' পত্রিকায় তাঁর কবিতাটি ছেপে বেরোক। কোনো পত্রিকা 'নামজাদা' হয়, কালক্রমে হয়ে ওঠে, নানা

কারণে। 'নামজাদা' পত্রিকা ব্যাপারটা সম্বন্ধে কী তরুণ কী প্রবীণ প্রত্যেক কবিরই নিজ নিজ ধারণা থাকে— সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে চালু সাধারণ ধারণা ছাড়া। একদা বহু বছর সম্ভবত এই গোত্রের একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনায় সহযোগিতা করার কাজে আর কাগজটির হাঁড়িহেঁশেলে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে আমি বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী, নিজে কবিতা লিখি বলে সেগুলি প্রকাশের উদ্যোগে যে অভিজ্ঞতা সেসব তো রয়েইছে। বলতে গেলে সাত কাহন। সে ঝাঁপি এখন খুলে বসার অবকাশ কই। আমি দেখেছি 'দেশ'-এ কবিতা বেরনোর চেয়ে 'অলিন্দ'-এ কবিতা বেরলে একজন কবির কী তৃপ্তি আর আহ্লাদ! 'দেশ'-এ কবিতা বেরনোর আনন্দ নিশ্চয় কম নয়, হয়ত অনেকের কাছে অনেক বেশিই। এ তো আমরা সবাই জানি যে এক সময় 'কবিতা' পত্রিকায় কোনো তরুণ কবির কবিতা বেরনো ছিল কবিতার সাম্রাজ্য জয় করে নেওয়ার তুল্য। 'কবিতা'-য় কবিতা বের করতে না পারলে তরুণ কবিতালিখিয়ের ললাটে কবি আখ্যা জুটত না, তেমন একটা যুগ ছিল। তেমনই ছিল পরিচয় আর চতুরঙ্গে কবিতা বের হওয়ার জৌলুস। যেখানে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে কবিতা লেখেন সেই কাগজে কিনা তোমার কবিতা বেরোচ্ছে! এ-ও হয়! পরে ব্যাপকভাবে এই স্থান নিল কৃত্তিবাস। সঙ্গে ছিল শতভিষা, অলিন্দ, ধ্রুপদী, একক, কবিপত্র, অনুষ্টুপ। আরও পরের কথায় যাচ্ছি না। নিজেরা মনে করে দেখুন।

কবি যেমন সম্পাদকের কাছে পৌঁছতে চান, সম্পাদককেও সদয় চিত্তে সাগ্রহে কবির দিকে এগিয়ে আসতে হয়। শুনেছি চতুরঙ্গের অলিখিত সম্পাদক-সংগঠক আতাউর রহমান ছিলেন এরকমই এক উদারচিত্ত সংস্কৃতিবান— কবিঅন্তঃপ্রাণ। তাঁর দৃষ্টির পরিসর ছিল ব্যাপক, বৃহৎ। হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান মিলে চতুরঙ্গকে স্থাপন করেছিলেন সংকীর্ণ গোষ্ঠীমনস্কতার ঊর্ধ্বে। এই সূত্রে এমন বললে কি আপনারা আমাকে মাফ করবেন যে অধিকাংশ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জন্মের পিছনে থাকে এক ধরনের গোষ্ঠীচেতনা? কতিপয় স্বপ্নদর্শী যুবকের চেতনা থেকেই তো জন্ম নেয় লিট্‌ল ম্যাগাজিন বা গ্রুপ থিয়েটার। কিছু যুবক (তরুণীরাও থাকতে পারেন অবশ্যই সংখ্যায় অল্প হলেও) তাদের নিজেদের (নতুন ধরনের) লেখা প্রকাশের নিয়মিত রূপে তাদের লেখা প্রকাশ করে চলার আর সমকালের নজর কাড়ার বা মন আলোড়িত করার দুর্মর বাসনা থেকেই গড়ে তোলে ছোটপত্রিকা। কালক্রমে কয়েকজনের সঙ্গে যোগ দেয় আরও কয়েকজন। কিন্তু কোনো পত্রিকার বা সেই পত্রিকার সম্পাদকের বা সম্পাদকমণ্ডলীর (লিখিত বা অলিখিত) সার্থকতা কি কেবল এতেই যে তাঁরা কয়েকজন মিলে কবিতার (বা সাহিত্যের যে কোনো গোত্রের) একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করতে সফল হয়েছেন? মাত্র কয়েকজন মিলে নিজেদের সময়-শ্রম-অর্থ 'অপচয়' করে সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেরা নামডাক করতে পেরেছেন? ব্যাস!

'আমাদের' কাগজে 'আমরা' ছাড়া আর কারো ঠাঁই হবে না— এই উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কাগজ বের হলে তখন কি তার ক্ষেত্রে 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করা সমীচীন হবে? কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের চিন্তাচেতনাকল্পনা থেকে এবং অর্থ-উদ্যম আশ্রয়

করে জন্ম নিলেও প্রথমাবস্থার এই একান্ত গোষ্ঠীমনস্কতা কাটিয়ে না উঠলে এবং মাত্র কয়েকজন কবি ও লেখকের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যসাধনের বাহন হয়ে ওঠার স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে না পারলে পুরো উদ্যোগটি এক মামুলি হাস্যকরতায় পর্যবসিত হয়। একসময় পাঠকসমাজ-লেখকসমাজ বুঝে ফেলেন যে এটি আসলে এক ঘরোয়া কাগজ— অল্প কয়েকজন লেখেন আর স্বল্প কয়েকজনের মধ্যে বিতরিত হয়। এর কবি-লেখকগণ মনোনীত, পূর্বনির্ধারিত; বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মালদা-কোচবিহার থেকে ডাকে আসা কোনো তরুণ কবির কবিতা কিংবা প্রবন্ধ সেখানে ছাপা হয় না— পরম নৈপুণ্যের স্বর্গীয় মান অর্জন করতে পারেনি বলে হেলায় ফেলে দেওয়া হয়; নিহিতার্থ— এ ধরনের অনামন্ত্রিত লেখাকেও স্থান দিতে হলে 'মনোনীত' ব্যক্তিদের লেখার তো স্থানাভাব ঘটে যাবে। কাজেই অনাহূত অনামন্ত্রিত কবিতা বা গদ্য বাতিল করো। পত্রিকা দপ্তরে অনাহূত লেখা যাতে না এসে পড়ে বিপত্তি বাধায় তার বন্দোবস্ত করো। সম্পাদকের গণ্ডির বাইরের অচেনা কেউ লেখা দিতে চাইলে তাকে নিরুৎসাহিত করো। সমাজদেহকে কলুষিত করে রাখা 'বহিরাগত'-র ধারণাটি যখন কোনো সম্পাদক তাঁর পত্রিকা সম্পাদনা-পরিচালনার ব্যাপারে নিপুণ কৌশলে প্রয়োগ করেন সাহিত্যক্ষেত্রে সে বড় পরিতাপের বিষয়। কারণ 'সাহিত্য'-র তাৎপর্যকে তা ভেঙে চুরমার করে দেয়, ব্যঞ্জনাকে নস্যাৎ করে ফেলে।